বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং (GLOBAL WARMING)

Source: https://bhoogolok.com

গ্রীন হাউস প্রভাব, ওজোন স্তরের ক্ষয়, অরণ্যচ্ছেদন প্রভৃতি কারণে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বিগত ৮০০০ বছর ধরে এই তাপমাত্রা প্রায় স্থির ছিল। কিন্তু গত ১০০ বছরের হিসেবে প্রমাণিত যে এই তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষণা করে দেখা গেছে, বিগত ১০০ বৎসরে পৃথিবীর তাপমাত্রা ০.৫° C বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ১.৫°-২.০° C পর্যন্ত এবং ২১০০ সালের মধ্যে ১.৮°C থেকে ৬.৩° C এর মতো বৃদ্ধি পেতে পারে। সারা পৃথিবী জুড়ে উষ্ণতার এই ক্রমবর্দ্ধমান বৃদ্ধিকেই বিজ্ঞানীরা বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং (Global Warming) নামে অভিহিত করেছেন।

বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর কারনঃ বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং – এর কারনগুলি হলো নিম্নরূপ –

১) জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার বৃদ্ধিঃ কলকারখানা, যানবাহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন সবকিছুতেই জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার দিন দিন বাড়ার ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমণের পরিমাণও দিন দিন লাফিয়ে বাড়ছে।

২) CFC-এর ব্যবহার হ্রাসঃ ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (CFC11, CFC12) বা ফ্রেয়ন একটি বিশেষ যৌগ, যা ওজোন স্তর বিনাশনের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। এই CFC প্রধানত রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, ফোম শিল্প, রং শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, সুগন্ধি শিল্প, কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রের সার্কিট পরিষ্কার প্রভৃতি ক্ষেত্র থেকে নির্গত হয়।

২) নাইট্রাস অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফারের কণা উৎপাদন বৃদ্ধিঃ কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের ব্যবহার, যানবাহন, নাইলন শিল্প প্রভৃতি কলকারখানা-যানবাহনের বিষাক্ত কালো ধোঁয়া, ট্যানারি কারখানার বর্জ্য পদার্থ, জেট বিমান,

রকেট উৎক্ষেপণ, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র প্রভৃতি থেকে নাইট্রাস অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফারের কণা নির্গত হয়; যেগুলি বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী এক একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

৩) অরণ্যচ্ছেদনঃ গাছপালা উজাড় হওয়ার ফলে বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড শুষে নেওয়ার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে।

৪) মিথেনের পরিমান বৃদ্ধিঃ গাছপালার পচন, কৃষিজ বর্জ্য এবং জীবজন্তুদের বর্জ্য থেকে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলাফলঃ বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং – এর ফলাফলগুলি হলো নিম্নরূপ –

ক) পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিঃ বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে পৃথিবী গত ২০ লাখ বছরের মধ্যে সবচেয়ে গরম হয়ে যাবে। ১৮৮০ সাল থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা ০.৬° C বেড়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর উষ্ণতা ২.৫° C এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ৩.৮° C বেড়ে যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গত ২০০০০ বছরের তুলনায় শেষ শতকে বিশ্বের উষ্ণতা বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। বিংশ শতাব্দীর দুটি অধ্যায়ে (যথা – ১৯২০-১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ এবং ১৯৭৬-২০০০ খ্রিষ্টাব্দ) উষ্ণতা সবথেকে বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে হিসাব করলে বিশ্বের উষ্ণতম দশক হচ্ছে ১৯৯০ এর দশক। নাসার গোদার্দ ইনস্টিটিউট ফর স্পেন স্টাডিজের হিসাব অনুযায়ী ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে উষ্ণতম বছর। কিন্তু ওয়ার্ল্ড মিটিয়েরোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট ও ক্লাইমেট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মতে, উষ্ণতম বছর হলো ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ এবং দ্বিতীয় উষ্ণতম বছর হলো ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ।

খ) মেরু অঞ্চলের বরফ গলনঃ বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে বিষুবীয় ও মেরু অঞ্চলের তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে। মনে করা হচ্ছে, আর ১০০ বছরের মধ্যে হিমশৈলসহ সুমেরু কুমেরুতে জমে থাকা সমস্ত বরফ জলে পরিনত হবে। শীতে অল্প বরফ থাকবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের পর উত্তর মহাসাগরের বরফের স্তর প্রায় ২৭% হ্রাস পেয়েছে।

গ) সমুদ্র জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধিঃ এই ক্রমবর্ধমান উষ্ণতার ফলে বিষুবীয় ও মেরু অঞ্চলের জমে থাকা বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রের জলস্তর ৩০ – ৪০ সেন্টিমিটার বেড়ে যাবে। এর ফলে পৃথিবীর উপকূলবর্তী এলাকার (ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশসহ) একটি বিরাট অংশ সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। উল্লেখ্য, পৃথিবীতে সঞ্চিত সমস্ত বরফ গলে গেলে সমুদ্রপৃষ্ঠের জলতলের উচ্চতা প্রায় ৫০ মিটার বেড়ে যাবে।

ঘ) রোগের প্রকোপ বৃদ্ধিঃ ম্যালেরিয়া, গোদ, কলেরা ডেঙ্গু প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বাড়বে; তার কারণ জল বাড়লে মশা বাড়বে। আরো ভিন্ন রোগ ফিরে আসবে ,নতুন রোগ আসবে। কেনিয়ার উচ্চভূমিতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে অতীতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ প্রায় ছিল না বললেই চলে। ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় ৬৯০০ ফুট উচ্চতায় এইপ্রথম ম্যালেরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে। কলম্বিয়ার আন্দিজ পর্বতমালায় ৭০০০ ফুট উচ্চতায় ডেঙ্গু ও পীতজ্বর সংক্রামক মশার সংখ্যা বাড়ছে।

ঙ) বাস্তুতন্ত্রের বিনাশঃ সমুদ্রে ক্ষারের পরিমাণ কমবে, ফলে ক্ষারে বেচে থাকা জীবের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে বাস্তুতন্ত্রের বিনাশ ঘটবে। গত ৫০ বছরে মেরুপ্রদেশে পেঙ্গুইনের সংখ্যা কমে অর্ধেক হয়ে গেছে। এছাড়াও, গত ৫০ বছরে বিশ্বের ২৭% প্রবাল প্রাচীর ধ্বংস হয়ে গেছে। উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে স্কটল্যান্ডের জীববৈচিত্রের বিনাশ ঘটেছে। ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে হাজার হাজার পক্ষীকূলের বিনাশ ঘটছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী ২০ বছরের মধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলের জীববৈচিত্রের প্রায় ৫০% ধ্বংস হয়ে যাবে।

চ) আবহাওয়ার প্রকৃতি পরিবর্তনঃ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবার ফলে অধঃক্ষেপণের পরিমাণ, ঝড়ঝঞ্ঝার প্রকোপ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাবে। ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। বৃষ্টিবহুল এলাকা নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে ক্রমশ বাড়তে থাকবে। ফলে আবহাওয়ার প্রকৃতিরও পরিবর্তন হবে। এথেন্স, শিকাগো, দিল্লী, প্যারিসসহ পৃথিবীর অন্যান্য শহরে গ্রীষ্মকাল স্বাভাবিকের তুলনায় দীর্ঘস্থায়ীও যেমন হচ্ছে, তেমনই গ্রীষ্মকালে অসহনীয় গরমও পড়ছে। তিব্বত, আফগানিস্তান, ভারত, নেপালসহ বহু দেশে শীতকাল স্বল্পস্থায়ী হওয়ার পাশাপাশি শীতের মাত্রাও কমে গেছে। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে গ্লাসগো ও মন্টানায় তাপমাত্রা সারাবছরে একবারও ০°C এর নীচে নামেনি, যা সেখানকার অদ্যাবধিকাল পর্যন্ত সর্বকালীন রেকর্ড। আবার, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ ছিল নিউইয়র্কের ইতিহাসে উষ্ণতম ও শুষ্কতম বছর।

ছ) ফসলের ক্ষতিঃ আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে ফসলের সমূহ ক্ষতি হবে এবং উৎপাদন কমে যাবে।

এছাড়াও, জ) বনাঞ্চল ধ্বংস হবে (১৯৯৮ সালে ইন্দোনেশিয়ায় এক ভয়াবহ দাবানলে প্রায় ২০ লক্ষ একর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে), ঝ) পানীয় জলে সংক্রমণ দেখা দেবে, ঞ) বন্যজন্তুর সংখ্যা হ্রাস পাবে, ট) মানুষের আবাসস্থলের সংকট দেখা দেবে, ঠ) বিশ্বজুড়ে খাদ্যভাব প্রকট হবে, ড) স্থানবিশেষে কোথাও খরা, আবার কোথাও বন্যার প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে (১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে সারা পৃথিবীজুড়েই খরা ও বন্যার পরিমান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে), ড) দুর্ভিক্ষ, মহামারী, খাদ্যদাঙ্গা শুরু হবে। সব মিলিয়ে পৃথিবীতে নতুন নতুন ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হবে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ন্ত্রনের উপায়ঃ বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি হলো নিম্নরূপ –

ক) জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার হ্রাসঃ কলকারখানা, যানবাহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন সবকিছুতেই জীবাশ্ম জ্বালানী জ্বালানোর পরিমাণ ক্রমশ যতটা পারা যায় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যাতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের পরিমান যথাসম্ভব কমাতে সম্ভব হয়।

খ) রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাসঃ কৃষিতে নাইট্রোজেন সার (যেমন ইউরিয়া) ব্যাবহারের ফলে বাড়ছে নাইট্রজেন অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ। অবিলম্বে কৃষিকাজে রাসায়নিক সারের ব্যবহার যথাসম্ভব কমাতে হবে।

গ) মিথেন নির্গমনের পরিমাণ হ্রাসঃ গাছপালার পচন এবং জীব জন্তুদের বর্জ্য থেকে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিথেনের এই সকল উৎসগুলিকে অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

ঘ) অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিঃ অচিরাচরিত শক্তি বলতে সেইসব শক্তিকেই বোঝায় যাদের ব্যবহার এখনও পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে সেই অর্থে প্রচলিত হয়নি। এইসকল শক্তির অধিকাংশেরই উৎস পুনর্নবীকরণ করা যাবে অর্থাৎ, ফুরিয়ে গেলে আবার তৈরি করে নেওয়া সম্ভব। জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহারে বায়ুমন্ডলে গ্রীণ হাউস গ্যাসের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে। ফলে হুমকির মুখে পড়ছে পরিবেশ। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রচলিত জীবাশ্ম জ্বালানীর পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানী ব্যবহার করলে বায়ুমন্ডলে গ্রীণ হাউস গ্যাস (যেমন – কার্বন-ডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, ওজোন) এর পরিমাণ কমে আসবে। ফলে পরিবেশ দূষণ অনেকটাই কমে যাবে। সাম্প্রতিক কালে এই অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি নিয়ে ব্যাপকভাবে আলাপ আলোচনা হচ্ছে। এই চিরাচরিত শক্তিগুলি হল – সৌর শক্তি, বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস, বায়োডিজেল, জোয়ার-ভাটা শক্তি, ভূ-তাপীয় শক্তি, আবর্জনা থেকে প্রাপ্ত শক্তি, নিউক্লিয়ার এনার্জি প্রভৃতি।

ঙ) ই-ওয়েস্ট বা ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য আমদানী বন্ধঃ উন্নত বিশ্বের দেশগুলো থেকে নানা ধরণের ই-ওয়েস্ট বা ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য আমদানী হচ্ছে আমাদের দেশে। প্রতি বছর প্রায়

৬০০ মিলিয়ন ব্যবহৃত (সেকেন্ড হ্যান্ড) কম্পিউটার তৃতীয় বিশ্বে পাঠানো হচ্ছে। এসব কম্পিউটারের অন্যতম ক্রেতা হলো চীন, ভারত ও বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলি; অর্থাৎ, তৃতীয় বিশ্বের এইসকল দেশগুলিকে ইলেক্ট্রনিক বর্জ্যের আস্তাকুড়ে পরিণত করা হচ্ছে। এইসব ই-বর্জ্যের মধ্যে হাজার হাজার টন সীসাসহ রয়েছে আরও বহু বিষাক্ত উপাদান, যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতি বয়ে নিয়ে আসছে। এসব দূষিত বর্জ্য পদার্থ বিভিন্নভাবে বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সরাসরি কৃষি সম্পদ, মৎস্যসম্পদ, বনজ সম্পদ বিনষ্টেরও অন্যতম কারণ।

চ) পরিকল্পিত বনায়নঃ বিশ্বজুড়ে যখন বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষেধক হলো অরণ্য। একদিকে অরণ্যচ্ছেদন রোধ ও অন্যদিকে পরিকল্পিতভাবে বনায়নের মধ্য দিয়ে বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ছ) শক্তিসাশ্রয়ী আবাসনঃ আমাদের জীবনযাপনের সবক্ষেত্রেই পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। বড় বড় অট্টালিকা, বাড়িঘর বা বড় দালান নির্মাণে প্রয়োজনীয় খালি জায়গা রাখতে হবে। প্রাকৃতিক আলো-বাতাসের প্রবেশ যেন সহজে হয় সে ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে যাতে কম বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাতে হয়। লিফট, জেনারেটর, এয়ার কন্ডিশন এসবের ব্যবহার কমাতে গ্রীণ বিল্ডিং টেকনোলজির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। শহরের পাশাপাশি গ্রামের বাড়িঘর নির্মাণেও বিদ্যুত সাশ্রয়ী সবুজায়ন প্রয়োজন।

জ) পরিবেশ রক্ষাসংক্রান্ত চুক্তিগুলির দ্রুত বাস্তব রূপায়ণঃ বিশ্বে ক্রমবর্দ্ধমান বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে চুক্তিগুলির দ্রুত বাস্তব রূপায়ণ খুবই দরকার। কেবলমাত্র আলাপ-আলোচনা নয়, দরকার গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির দ্রুত ও বাস্তব রূপায়ণ।

ঝ) বিকল্প ও পরিবেশবান্ধব দ্রব্য ব্যবহারঃ গ্রীন হাউস প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদানগুলির বিকল্প ও পরিবেশবান্ধব দ্রব্য ব্যবহারের উপর জোর দিতে হবে।

ঞ) নতুন প্রযুক্তিঃ বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধের চুড়ান্ত উত্তর হচ্ছে নতুন প্রযুক্তি। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত উপাদান পরিবর্তন, যানবাহনের দক্ষতা বৃদ্ধি, কার্বন-ডাই-অক্সাইড পৃথকীকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন প্রভৃতিসহ বিভিন্ন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করতে হবে।

ট) নাগরিক দায়িত্বঃ পরিবেশ রক্ষা নাগরিকদের মৌলিক দায়িত্ব। তাই বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং সৃষ্টিকারী উপাদানগুলি যাতে পরিবেশে কম পরিমানে উৎপাদিত হয়, সে বিষয়ে সকলকেই দায়িত্বশীল হতে হবে।